যুগান্তর

তারিখ 03 MAR 2014
পৃষ্ঠা ৫ ৬

ড. মোঃ ইকবাল হোছাইন

শিশুর ওপর সিলেবাসের চাপ মানসিক নির্যাতনস্বরূপ

বিগত সরকারের পাঁচ বছরের সেরা সফলতার মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের কথা বারবার বলা হয়। ব্যক্তিগত মতভার কারণে দুর্নীতির ছোবলমুক্ত শিক্ষামন্ত্রীর ইমেজকে দলীয় কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমার আপত্তি খোদ সংস্কারের সস্তা ডামাডোল নিয়ে। সরকারের সফলতার বড় দিক বলা হয় প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষাকে (পিএসসি)। এ সংস্কারের পর শিক্ষক, গবেষক, মনোবিজ্ঞানী, এমনকি শিশু অধিকার নিয়ে যারা কাজ করে এমন কারও তরফ থেকে বিশেষ কোনো প্রতিবাদ হয়েছে বলে শোনা যায়নি। প্রশংসার জোয়ারের কাছে সমালোচনার ভাষা হারিয়ে গেছে হয়তোবা। আমি নিজে মনোবিজ্ঞানী নই। তবে একজন বাবা হিসেবে প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেটের মতো একটি পরীক্ষাকে শিশুদের ওপর একরকম নির্যাতন বলে মনে করি। জেএসসি না হয় এসএসসির প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন। কিন্তু পিএসসি কেন? যে শিশুটি (ছেলেমেয়ে) মাত্র দশ বছরে পা দিয়েছে, এখনও নিজের ড্রেস পরা ঠিকভাবে শেখেনি, নিজের খাবারটি ভালোভাবে খেতে পারে না— তাদের জন্য আবার পাবলিক পরীক্ষা?

পিতা-মাতাই বোঝেন সন্তানের মনের ওপর এর কী চাপ পড়ে। পঞ্চম শ্রেণী পড়ুয়া সন্তানের সিলেবাস শেষ করাতে পিতা-মাতার যে ঘাম ছুটে, এর হিসাব কি কেউ করেছেন? আর সিলেবাসের কথা তো বলাই বাহুল্য। বড় হয়ে শিক্ষিত হয় কি-না, এ চিন্তা থেকেই মনে হয় আমাদের শিক্ষাবিদরা প্রাইমারিতে সবকিছু শেখানোর পরিকল্পনা করেছেন। শিশু শ্রেণীতে সাধারণ জ্ঞান, ইংরেজি, বিজ্ঞান, ধর্ম, গণিত, কম্পিউটার, সোশ্যাল স্টাডিজ, স্টোরি আর বাংলা তো আছেই। বেচারা শিশু আর যায় কোথায়? শিশুর মানসিক বিকাশের কোনো চিন্তা কি আছে? স্কুলে খেলার মাঠ, লাইব্রেরি ও বাচ্চাদের ফ্রেন্ডলি পরিবেশ— এসব ব্যাপারে শিশু গবেষকদের কোনো চিন্তা আছে কি? শিশুর মানসিক বিকাশের কোনো চিন্তা না করে কেবল সিলেবাসের চাপ দেয়া কেন? সকাল-বিকাল কোথায় ছোটমণিরা খেলাধুলা করবে, তা না করে কেবল প্রাইভেট টিউটরের কাছে দৌড়ঝাঁপ! সিলেবাসের বইগুলো পর্যন্ত এসব শিশু বহন করতে পারে না। বইয়ের ব্যাগ অভিভাবকদের বহন করে নিয়ে যেতে হয়। এতে অনেক শিশু মানসিক রোগী হয়ে যাচ্ছে।

যে কেউ দশটি শিশুকে প্রশ্ন করবেন, অন্তত সাতজনই স্কুল ভালো লাগে না বলে উত্তর দেবে। এর কারণ কী? একবার কি আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনাবিদরা ভেবে দেখেছেন? অথচ উন্নত বিশ্বে, বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, শিশুরা স্কুলে যাওয়ার জন্য পাগল থাকে। সকাল ৮টা থেকেই তাদের আর ঘরে রাখা যায় না। পিএসসির মতো পরীক্ষা তো দূরের কথা, বাসা থেকে কোনো বই স্কুলে বহন করে নিয়ে যেতে হয় না। শিক্ষকদের কাছে হয়তো শিক্ষা পরিকল্পনা থাকে, তবে শিশুরা চাপে পড়বে এ ভয়ে তাদের কাছে তা সরবরাহ করা হয় না। অভিভাবকদের ডেকে সন্তানদের মানসিক গতিধারা ব্যাখ্যা করা হয়। বাসায় সন্তানের মানসিক কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কি-না, এ ব্যাপারে পিতা-মাতার কাছে তথ্য চাওয়া হয়।

হাতে-কলমে শিক্ষার বিষয়টি বিশ্বের প্রায় সব দেশেই গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। ব্রিটেনে শিশুদের বাস্তবমুখী শিক্ষা দেয়ার জন্য বিভিন্ন ইভেন্টের আয়োজন করা হয় এবং সেসব বিষয় শিশুর উপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়। যেমন ট্রাফিক সম্পর্কে শেখানোর সময় শিশুদের রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিভাবে রাস্তা পার হতে হয়, রোড সতর্কতায় কী করতে হয়, ট্রাফিক কাকে বলে? হেলথ অ্যান্ড সেফটি কী? বাসায় কিভাবে মা-কে সাহায্য করতে হয়? বাসায় তালা আটকে গেলে কিভাবে পুলিশে খবর দিতে হবে— সবই তাদের শিক্ষা তালিকায় আছে।

উপরে যে বিষয়গুলোর কথা বললাম, এর একটিকেও আমাদের দেশে পরিকল্পনাবিদরা পাঠ উপযুক্ত মনে করেন বলে মনে হয় না। অথচ এসবই তাদের শিক্ষাভুক্ত বিষয় হওয়া উচিত ছিল। ২০ নভেম্বর ২০১৩ শুরু হওয়া পিএসসি পরীক্ষায় আবার নতুন সংযোজন দেখছি। প্রথমদিন থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার খবর শুনছি। আবার অনেককে নেট থেকে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন নিয়ে বাড়ি যেতে দেখছি। কোমলমতি শিশুদের এ বয়স থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো অনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত করা, ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্র সংগ্রহে অভিভাবকের দৌড়ঝাঁপ রাজনৈতিক নেতাদের না ভাবালেও জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের মতো নিরীহ পিতা-মাতাকে শঙ্কিত করে তোলে। কারণ জাতির বোঝা এসব নেতা তাদের সন্তানদের এ দেশে পড়ান না, তাই এ বিষয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনেক ক্ষেত্রে সফলতার দাবিদার এ রাষ্ট্রের শিশুনীতি অনেকাংশে প্রশংসার দাবি রাখে। তবে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১-তে শিশুর যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তাতে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা রয়েছে। সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— 'শিশু বলতে আঠারো বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে'। আর কিশোর-কিশোরী বলতে '১৪ বছর থেকে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুকে বোঝানো হয়েছে'।

আমাদের নীতিমালায় সম্ভবত আমেরিকান সংজ্ঞাকে আমলে নেয়া হয়েছে। ভারতের সংবিধানে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বয়সসীমা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুদের বয়সসীমা কমিয়ে আনা উচিত। ইউরোপ ও আমেরিকার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশুদের অধিকার ও বেড়ে ওঠার আবহ আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এক নয়। শিশুদের বয়স যদি ১৪ বছরও করা হয় তাহলেও তাদের বেড়ে ওঠার যথাযথ ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি এ কথা বলা যাবে না। বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ থাকলেও এখনও যন্ত্রতন্ত্র উন্মুক্তভাবে শিশুদের কাজ করতে দেখা যায়। একদিকে শিশুদের মানসিকতা ও স্বাভাবিক বেড়ে ওঠায় প্রভাব পড়বে বলে তাদের অনেক ধরনের প্রয়োজনীয় কর্মকে আইনিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অপরদিকে পরীক্ষার নামে তাদের ওপর মানসিক চাপ বাড়ানো হয়েছে। এটা কি দ্বিমুখী নীতি নয়? দ্বান্দ্বিক ও বৈসাদৃশ্যপূর্ণ এসব নীতি থেকে বেরিয়ে না এলে আমাদের ভবিষ্যৎ যথাযথভাবে নিরাপদ করা যাবে না।

জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষা সম্পন্ন আধুনিকমনস্ক একটি ধারাবাহিক শিক্ষাব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে কিছুটা সময় ও ঝুঁকি তো মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে নিতেই হবে। আমি বিশ্বাস করি, এ সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য তার আছে। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কারের স্বার্থে যদি এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে আমি মনে করি আরেকটি সংস্কার খুব প্রয়োজন। আর তা হল ধীরে ধীরে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বইয়ের আধিক্য উঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং একই সঙ্গে হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। বইয়ের চাপ থেকে উদ্ধার করে শিশুদের বন্ধুসুলভ ক্যাম্পাস হিসেবে প্রাইমারি স্কুলগুলোকে যদি গড়ে তোলা যায়, তাহলে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন আসবে এবং জাতি এর সুফল ভোগ করতে পারবে।

ড. মোঃ ইকবাল হোছাইন : *অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া*